যমজ কাহিনী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মাস তিনেক আগে কেনা হয়েছিল হাঁসগুলো। মোট আটটা। বোলপুর বাজারে শুধু রবিবার হাঁস বিক্রি হয়, আশেপাশের গ্রাম থেকে নিয়ে আসে চাষীরা। বেশ ছোট ছিল তখন। বাচ্চা হাঁস দেখতে তেমন ভাল হয় না, কেমন যেন দুর্বল প্রাণী মনে হয়। বাচ্চা কুকুর দেখলেই যেমন আদর করতে ইচ্ছে করে, হাঁসেরা তেমন নয়।

এই তিন মাসেই বেশ বড় হয়ে গেছে। পুকুরের জলে ভেসে বেড়ায়। এখন তাদের রূপ ফুটেছে খুব। তেজী আর স্বাস্থ্যবতী। প্রত্যেকটিরই পালকে কত রকম রঙ।

জানলা দিয়ে পুকুরটা দেখা যায়।

কলম হাতে নিয়ে লেখক চেয়ে থাকেন পুকুরের দিকে। তাঁকে একটা গল্প লিখতে হবে। এখনও এক লাইনও শুরু হয়নি।

হাঁসেদের মধ্যে কোনটি পুরুষ আর কোনটি মেয়ে, চেনা খুব শক্ত। ডাক শুনে বুঝতে হয়। কোনও কোনও হাঁস দারুণ গলার জোরে প্যাক প্যাক করে ডাকে, কোনও কোনও হাঁসের ডাক ফ্যাঁসফেঁসে ধরনের। ওরা এখনও ডিম দিতে শুরু করেনি। দীনবন্ধুর মতে, এবার যে কোনও দিন ডিম পাড়বে।

গল্প লিখতে হবে, এখনও লেখকের মাথায় কিছুই আসছে না।

পুকুরটা বেশি বড় নয়। শীতকালে তো খুবই ছোট দেখায়। এখন ভরা বরষায় থই থই করছে। পদ্মপাতায় ছেয়ে গেছে অনেকটা।

হাঁসগুলো মাঝে মাঝে জল থেকে উঠে এসে পাড়ে ঘুরে বেড়ায়। হাঁসেদের মধ্যে একেবারেই দলাদলি নেই। আটখানা হাঁস সবসময় এক সঙ্গে থাকে। একজন জল থেকে উঠে এলেই অন্যরাও আর জলে থাকে না। কাছাকাছি কোনও মানুষ দেখলেই ওরা আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক সঙ্গে।

বাগানের লোহার গেটটা কেউ খুললেই ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হয়। অমনি সে দিকে চোখ চলে যায়।

সেই বুড়িটা এসে ঢুকছে। একেবারে খুনখুনে বুড়ি। মনে হয়, বয়েসের গাছ-পাথর নেই। কেউ যদি বলে, একশোর বেশি, তাও অবিশ্বাস্য মনে হবে না। শরীরটা দুমড়ে বেঁকে গেছে, কোনও ক্রমে হাঁটতে পারে, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠার ক্ষমতা নেই। সিঁড়ির কাছে এসে বসে পড়ে।

পাশের রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে দুটি তরুণী। পৃথিবীর নিয়মই এই, বুড়ির বদলে যুবতী মেয়েদের দিকেই পুরুষ মানুষের আগে চোখ যাবে।

দুটি তরুণীরই সাজপোশাকের চাকচিক্য দেখে বোঝা যায়, তারা শহুরে মেয়ে। দুজনের যেন একই রকম চেহারা। যমজ নাকি ?

লেখক কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

মাঝে মাঝে তাঁর কাছে মেয়েরা দেখা করতে আসে। অটোগ্রাফ চায়। তবে, সাধারণত তাদের সঙ্গে একজন পুরুষ থাকে। আবার অনেকে ছুটির দিনে এখানে জমি খুঁজতে আসে কলকাতা থেকে। তাদেরও সঙ্গে স্বামী কিংবা অভিভাবকদের থাকার কথা।

মেয়ে দুটি এ বাড়ির দিকেই তাকাচ্ছে।

সাধারণত লেখার সময় কেউ দেখা করতে এলে তিনি বিরক্ত হন। তবে মেয়েরা এলে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। গরমের সময় তাঁর খালি গায়ে থাকা অভ্যেস। কোনও দর্শনার্থী এলে তিনি গায়ে একটা জামা গলিয়ে নীচে নেমে যান।

যমজ মেয়ে কিংবা যমজ ছেলে নিয়ে তিনি এ পর্যন্ত কোনও গল্প লেখেননি। এই মেয়ে দুটির সঙ্গে কথা বললে একটা নতুন গল্পের উপাদান পাওয়া যেতে পারে।

উলটোদিক থেকে সাইকেলে একটি লোক আসছে। মেয়ে দুটি তাকে কী যেন জিজ্ঞেস করল। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল সামনের দিকে। ওরা অন্য কোনও বাড়ির সন্ধান করছে। খুব সম্ভবত ওরা বাংলা বই-টই পড়ে না।

বুড়িটা হেঁটে আসছে থপথপিয়ে। হাঁসগুলো তার পাশ দিয়ে চলে গেল। অন্য কোনও মানুষের এত কাছে ওরা আসে না। ওরা কি বুঝে গেছে যে এই বুড়ির পক্ষে হাত বাড়িয়ে একটা হাঁস ধরে ফেলারও ক্ষমতা নেই ?

বুড়িটা লেখকের চেনা। বারো বছর আগে শান্তিনিকেতনে এই বাড়িটি করার সময় থেকেই দেখছেন। একই রকম

চেহারা। এত আস্তে কথা বলে যে প্রায় বোঝাই যায় না। তবে এইটুকু জানা গেছে যে, তার দুই ছেলেই মারা গেছে। সে থাকে নাতির সংসারে। সেখানে যে সে পরম যত্ন-আদর পায় না, তা অনুমান করা শক্ত নয়। লেখকের স্ত্রী প্রতিবারই তাকে কুড়িটা টাকা দেন, সে বিড় বিড় করে অনেক আশীর্বাদ করতে করতে চলে যায়।

এই বুড়িটিকে নিয়ে কি লেখা যায় একটা গল্প ? যাবে না কেন, প্রত্যেকের জীবনেই তো গল্প আছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সতীনাথ ভাদুড়ির হাতে এরকম গল্প খোলে ভাল।

এই লেখকের মনে এখনও ঝিলিক মারছে, ওই তরুণী দুটি কি সত্যিই যমজ ছিল ? ওরা এ পাড়ায় কার বাড়িতে গেল ?

একবার এই বুড়িটি কিন্তু প্রায় একটি গল্পের উপাদান হয়ে উঠেছিল।

নতুন বাড়ি বানাবার পর প্রথ প্রথম খুব উৎসাহের সঙ্গে প্রতিবারই এসে ক্যামেরায় অনেক ছবি তোলা হত। সঙ্গে আসত বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়দের কেউ না কেউ। একবার সেই রকম ছবি তোলা হচ্ছে, সেই সময় এসে পড়ল এই বুড়ি। একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ও বাবা, আমার একটা ছবি তুলে দাও না গো ! আমার ছবি দেখি নাই কোনওদিন।

বুড়ির চোখ দুটো ঘোলাটে। দৃষ্টিশক্তি আছে কিনা সন্দেহ, যদিও নিজেই হেঁটে হেঁটে আসে। সেবার লেখকের দুই শ্যালিকা এসেছিল, ছোট শ্যালিকাটি জিজ্ঞেস করেছিল, ও বুড়িমা, তুমি চোখে দেখতে পাও ?

মাথা নাড়তে নাড়তে বুড়ি বলেছিল, না গো মা, সব ঝাপসা। এই তোমার মুখখানিও ভাল দেখতে পাচ্ছি না গো মা ! চোখ গেছে।

বোঝাই যায়, কখনও ছানি কাটানো হয়নি, এর চোখ দুটি প্রায় অন্ধই বলা যায়। ছবি তুললে তো নিজেই দেখতে পাবে না, তবু মানুষের ছবির প্রতি এমনই মায়া।

গ্রুপ ছবি ছাড়াও বুড়ির আলাদা করে দুটি ছবি সেদিন তুলেছিলেন লেখক। কিন্তু দু:খ ও লজ্জার কথা, সে ছবি ওঠেনি। বড় শ্যালিকার দুষ্টু ছেলেটি ক্যামেরাটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে পেছনটা একবার খুলে ফেলেছিল, আলো ঢুকে শেষের দিকে সাত-আটখানা ছবি সাদা হয়ে গেছে।

পরের বার গিয়ে বুড়িকে কী বলা হবে ? লেখক খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়েছিলেন। শ্যালিকার ছেলের উপর রাগ করাও যায় না।

ছোট শ্যালিকা বলেছিল, ওকে একটা অন্য ছবি দিয়ে দিন না। আমার ছবিটাই দিয়ে দিন। ও তো কিছু বুঝতেই পারবে না !

এই উপাদান নিয়ে অনায়াসেই একটা ছোট গল্প উৎরে দেওয়া যেত। বুড়িকে এক সুন্দরী যুবতীর ছবি দেওয়া হল, সে সেই ছবিখানা নিয়েই আনন্দ করতে করতে চলে গেল ...।

কিন্তু লেখক সে গল্প লেখেননি। এর মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতা আছে।

আসলে, পরের বার যাওয়ার পর বুড়ি আর সেই ছবির কথা জিজ্ঞেসই করেনি। তার কিছু মনে নেই। এর নির্ঘাৎ অ্যালজাইমার্স ডিজিজ আছে!

হঠাৎ পুকুরের জলে ঝপাং করে একটা জোর শব্দ হল।

লেখক এখনও গল্প শুরু করতে পারেননি। শব্দটায় চমকে উঠলেন। এত জোরে শব্দ কিসের হতে পারে?

উঠে গিয়ে তিনি অন্য জানলা দিয়ে দেখতে লাগলেন।

পুকুরধারে পাশাপাশি তিনটে তালগাছ। জমি কেনার সময় থেকেই এই গাছ তিনটে ছিল। লেখক যে কোনও গাছ কাটার বিরোধী। তাই বাড়ি তৈরির সময় এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যাতে গাছ তিনটিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। তারপর পাশ দিয়ে কাটা হয়েছে পুকুর। এখন গাছ তিনটিকে বেশ মানানসই মনে হয়। ছোট পুকুরটাকেও অনায়াসেই বলা যায়, তালপুকুর। নজরুলের কবিতা আছে, বাবুদের তালপুকুরে, হাবুদের ডালকুকুরে, সে কি বাস করলে তাড়া ...।

অন্য অনেক গাছেরই নারী-পুরুষ ভেদ থাকে না, কিংবা সহজে বোঝা যায় না, কিন্তু তালগাছ একেবারে মানুষেরই মতনই। তিনটে গাছের মধ্যে প্রথম একটি গাছে জটা বেরিয়ে এল! অর্থাৎ পুরুষ। কোনওদিন ফল হবে না। তৃতীয়টাতে পরের বছর ফুল ফুটল। যথা সময়ে পাওয়া গেল অনেক তাল, প্রায় তিরিশ-চল্লিশটা। মাঝখানের গাছটা এখনও চুপচাপ, নারী না পুরুষ বোঝা যাচ্ছে না। এই তিনটে তালগাছ নিয়েও তো গল্প লেখা যায়। মাঝখানের গাছটা যদি ফল ফলাতে শুরু করে, তা হলে দুজন নারী ও একজন পুরুষ। আর এরও যদি জটা বেরিয়ে আসে, তা হলে দুই পুরুষ ও এক নারী। অনায়াসে হতে পারে ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী।

কিন্তু আরম্ভ করা যাবে কী ভাবে?

ভাদ্র মাসে তাল নিজে থেকেই খসে পড়ে। এ বছর এই প্রথম শুরু হল। আর প্রথমটাই পড়েছে পুকুরে।

লেখক চেঁচিয়ে বললেন, দীনবন্ধু, একটা তাল পড়েছে, তুলে নাও!

তাল পড়ার শব্দে হাঁসগুলো ভয় পেয়ে পুকুরের অন্যদিকে ডাঙায় উঠে পড়েছে।

ওপরে উঠেই হাঁসগুলো ডানার জল ঝেড়ে ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঠিক যেমন মেয়েরা স্নান করে উঠে গামছা দিয়ে মাথার চুল ঝাড়ে।

মেয়েদের মাথার চুল ঝাড়ার দৃশ্য লেখক দেখলেন কোথায়? সবাই তো বাথরুমেই স্নান করে। গামছা তো উঠেই গেছে, তার বদলে এখন তোয়ালে। মেয়েরা আর বড় চুলও রাখে না। তাঁর ছোট শ্যালিকা ও তার এক বান্ধবী এই পুকুরে স্নান করেছে কয়েকবার। সাঁতার কেটে উঠেই গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে চলে গেছে বাড়ির ভেতরে বাথরুমে।

আসলে উপমাটা মনে আসে বাল্যস্মৃতি থেকে। ছেলেবেলায় গ্রামে দেখেছেন, মেয়েরা ব্লাউজ-শায়া না পরে, শুধু শাড়ি জড়িয়ে নামত পুকুরে। বিশেষ করে মনে পড়ে যমুনা পিসির কথা। লম্বা চুল ছিল পিঠ-ছাড়ানো, প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে চুল ঝাড়তেন গামছা দিয়ে, আর কী যেন গান গাইতেন গুণগুণিয়ে। লেখকের বয়েস তখন দশ কিংবা এগারো। আর যমুনা পিসির উনিশ-কুড়ি।

অন্য অনেক মেয়ের কথাই মনে নেই, শুধু যমুনা পিসির চেহারাটা এখনও স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে।

সেই যমুনা পিসি এখন কোথায়? ওঃ হো, তিনি তো আত্মহত্যা করেছিলেন গায়ে আগুন লাগিয়ে। তাই নিয়ে গ্রামে কী হইচই।

কেন আত্মহত্যা করেছিলেন? মনে নেই। কিংবা ওই বয়েসি ছেলের সামনে কেউ এ বিষয়ে আলোচনা করেনি।

ওই যমুনা পিসিকে নিয়ে গল্প লেখা যায় না? একটি কুমারী মেয়ের আত্মহত্যা ঘিরে অনেক রহস্য-রোমাঞ্চ থাকে। অনেক কিছু বানানোও যায়। একজন লোকের পক্ষে এসব খুব সোজা।

তবু কলমে একটা শব্দও লেখা হল না। প্রথম বাক্যটি লেখাই আসল কাজ, তারপর তরতরিয়ে এগিয়ে যায়।

যমুনা পিসির সঙ্গে আর একজনের মুখও মিশে যাচ্ছে। তার নামও যমুনা। কিন্তু যমুনা নামটি এখনও পুরোনো হয়নি। সেই কবে প্রমথেশ বড়ুয়ার স্ত্রীর নাম ছিল যমুনা, প্রথম দেবদাস ফিল্মের নায়িকা। লেখক সেই ফিল্ম দেখেননি। আজও কোনও কোনও মেয়ের নাম যমুনা হয়। 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসের নায়িকার নাম যমুনা ছিল না?

এই মহিলার নাম যমুনা চ্যাটার্জি, নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অধ্যাপিকা, বার্কলেতে থাকেন। দেশে আসেন মাঝে মাঝে। তাঁর স্বামী বিশ্বরূপ লেখকের এক বন্ধুর বন্ধু। গত বছর যমুনা আর বিশ্বরূপ শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসে দুদিন থেকে গেছে এই বাড়িতে।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব সুন্দর। দুজনেই অনেক লেখাপড়া জানে, আবার ঠাট্টা-ইয়ার্কি-আড্ডাতেও বেশ জমিয়ে তুলতে পারে। তবু দুজনের সম্পর্কের মধ্যে কোথাও যেন একটা সূক্ষ্ম ফাটল আছে, তা শুধু লেখকের চোখেই ধরা পড়েছিল।

একদিন বিকেলে ছাদে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। কাছেই সেই তিনটে তাল গাছ। যমুনা চ্যাটার্জি নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অত বড় পণ্ডিত হলেও তালগাছের যে নারী ও পুরুষ আলাদা হয়, তা জানে না। শহরের অনেক মেয়েই জানে না। যমুনা চ্যাটার্জি প্রথমে তালগাছকে মনে করেছিল নারকেল গাছ। কচি কচি তাল দেখে সে ভেবেছিল ডাব।

কথায় কথায় লেখক যখন বললেন, মাঝখানের গাছটার লিঙ্গটা নির্ণয় হয়নি, খুবই অবাক হয়ে গেল যমুনা। সে দুবার জিজ্ঞেস করল, সত্যিই এরকম বোঝা যায়?

লেখকের স্ত্রী বললেন, দেখো না, ওই যে ও পাশের গাছটা, মাথার কাছ থেকে জটা বেরিয়ে ঝুলছে, ওই লম্বা লম্বা

জটাতেই তো বোঝা যায় পুরুষ। আর এ পাশের গাছটায় অনেক তাল হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ। মাঝখানের গাছটা বোধহয় বয়েসে একটু ছোট, তাই এখনও কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কাল তোমাদের তালশাঁস খাওয়াব।

যমুনা বললেন, আমার ধারণা, মাঝখানের গাছটাও পুরুষই হবে।

লেখক বললেন, তা আগে থেকে বলা যায় না। মানে সেটা জানার কোনও উপায়ই নেই!

যমুনা বলল, আমি সামনের বছরেই এটা দেখবার জন্য আসব। মাঝখানের গাছটা কী হয়, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

একটা তালগাছের লিঙ্গ জানবার জন্য সুদূর আমেরিকা থেকে একজন চলে আসবে, এটা শুনতে অদ্ভুত লাগে!

যমুনার স্বামী জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ তোমার এত কৌতূহল কেন?

যমুনা তার দিকে যেন জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, ওই তালগাছটাও যদি পুরুষ হয়, ... আমি দেখতে চাই, ওরা পাশাপাশি কেমনভাবে থাকে! মানুষের মধ্যে তো, দুজন পুরুষ আর একজন মেয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক হলেও কত ঝগড়াঝাঁটি-মারামারি, কত ঈর্ষা, কত ভুল বোঝাবুঝি ...

লেখকের স্ত্রী হাসতে হাসতে বললেন, গাছেরা তো ঝগড়া করতে পারে না, মারামারি করাও সম্ভব নয়। তা ছাড়া আলাদা আলাদা মেয়ে গাছ আর ছেলে গাছ হলেও ওদের মধ্যে তো ঠিক শারীরিক সম্পর্ক হয় না।

যমুনা বলল, একজন মেয়ের যদি দুজন পুরুষের সঙ্গে শুধু মানসিক সম্পর্কও হয়, তাও কি মানুষরা সহ্য করতে পারে?

তখনই লেখক যমুনা চ্যাটার্জির জীবনে একটা গল্পের গন্ধ পেয়েছিলেন।

সে গল্পও লেখা হয়নি।

কয়েক মাস পরে লোকমুখে খবর পাওয়া গিয়েছিল, যমুনার সঙ্গে তার স্বামীর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

লেখক যা ভেবেছিলেন, বিচ্ছেদের কারণ মোটেই তা নয়। বিশ্বরূপ চ্যাটার্জির নাকি যৌন রোগ ধরা পড়েছে। অর্থাৎ তার একটা গোপন জীবন ছিল।

পরিচিত মানুষদের জীবনের ট্র্যাজেডি নিয়ে লেখক কিছু কাহিনী বানাতে চান না। অথচ সব কাহিনী তো জীবন থেকেই নিতে হয়।

দীনবন্ধু পুকুরে নেমে তালটা তুলছে। অত বড় ফল হলেও তাল জলে ডোবে না।

লেখকের স্ত্রী বুড়িটিকে টাকা দিয়ে দিলেও সে এখনও যায়নি। পুকুরধারে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করছে, ওটা পড়ল গো ? অ্যাঁ ? তাল নাকি অ্যাঁ ?

কেউ তার কথার উত্তর দিচ্ছে না -- বুড়িটির নিশ্চয়ই লোভ হয়েছে। কিন্তু বছরের প্রথম তাল অন্য কারওকে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এরপর অবশ্য অনেক তাল পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে।

আরও একজন বুড়ি আছে। কিছুটা বয়েস কম, গাঁট্টা-গোট্টা চেহারা, মাঝে মাঝে মুড়ি-চিঁড়ের মোয়া আর নাড়ু বিক্রি করতে আসে। মোটেই ভাল খেতে নয়, শুধুই কিটকিটে মিষ্টি। লেখক একদিন একটা মোয়া মুখে দিয়েই ফেলে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, নাঃ, মোয়া-টোয়া চলবে না, ওসব ছেলেবেলাতেই ভাল লাগে।

এখানে অল্প বয়েসি ছেলেমেয়ে কেউ নেই, মোয়া কে খাবে ? কলকাতা থেকে উৎপল এসেছে, সেও মোয়া পছন্দ করে না। মোয়াউলি কিছুতেই বারণ শোনে না। সে নিজেই গুণে গুণে প্রতিটি দশটা করে সাজিয়ে দেয় শালপাতায়। বলছি আমাদের লাগবে না, লেখকের স্ত্রী এরকম ধমক দিলে সেও রাগের সঙ্গে বলে ওঠে, তোমরা না নিলে আমার চলবে কী করে ? ইচ্ছে না হয় পয়সা দিও না !

তখন বাধ্য হয়েই তাকে পনেরো টাকা দিতে হয়। সে আবার পরের দিন আসে।

লেখকের স্ত্রী মাত্র একটা দুটো নাড়ু খান, বাকি সবই পড়ে থাকে। দীনবন্ধুও ওগুলো খায় না। সে অবশ্য অন্য কারণে। সে বৈষ্ণব, সব জাতের ছোঁয়া খায় না। বৈষ্ণব ধর্মের এই পরিণতি। চৈতন্যদেব কিন্তু এদিকে হরিদাসকেও কোল দিয়েছিলেন।

লেখক একদিন খেলাচ্ছলে হাঁসদের দিকে দুটো মোয়া ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। ওরা দিব্যি খেয়ে নিল। তবে ভেঙে দিলে সুবিধা হয়। হাঁসেরা সর্বভুক। ওদের খিদেরও শেষ নেই। সারা দিনে যত খাবারই দেওয়া হোক, ওরা ঠিক খেয়ে নেবে। শুধু নারকোল নাড়ুগুলো ওদের ঠিক পছন্দ নয়। ঠুকরে ঠুকরে চলে যায়।

বুড়ি এখনও দাঁড়িয়ে আছে। লেখকের স্ত্রী তার কাছে গিয়ে তার হাতে অনেকগুলো নারকোল নাড়ু তুলে দিলেন।

প্রথমটায় সে বুঝতে পারল না, কী জিনিস। মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে গন্ধ শুঁকলো, তারপর জিভ ঠেকাল।

তারপর সে মুখ তুলে এমন একটা স্বর্গীয় হাসি দিল, যেন এমন উপহার সে জীবনে পায়নি। নাড়ুগুলোকে বাড়ি থেকে বিদায় করার জন্যই যে তাকে দেওয়া হল, সে প্রশ্ন তোলা এখানে অবান্তর। যে পেয়েছে, তার খুশি হওয়াটাই বড় কথা।

সাইকেল রিকশা চেপে একজন কেউ আসছে, থামল এই বাড়ির গেটের সামনে। লেখক তাকিয়ে রইলেন, যুবকটি তাঁর অচেনা। কোনও নবীন লেখক কিংবা ছোট পত্রিকার সম্পাদক হতে পারে। যুবকটি খুবই রূপবান। লেখক হওয়ার চেয়ে তার পক্ষে সিনেমার নায়ক হওয়াটাই স্বাভাবিক। সিনেমা না হোক, টিভি সিরিয়ালে।

যুবকটি নামল না, দীনবন্ধুকে কী যেন জিজ্ঞেস করল, লেখক শুনতে পেলেন না।

সে চলে যাওয়ার পর দীনবন্ধু উপরের দিকে মুখ তুলে বলল, বোনোবানীর কথা জিজ্ঞেস করছিল।

লেখক তো জিজ্ঞেস করেননি, তবু দীনবন্ধু এটা জানাতে গেল কেন ? তবে লেখকের কৌতূহল হয়েছিল ঠিকই, সেই তরঙ্গ কি দীনবন্ধুর কাছেও পৌঁছে গেছে ?

বনবাণী নামে কাছেই একটা গেস্ট হাউস আছে। যমজ মেয়ে দুটিও কি সেখানেই গেছে ? এই ছেলেটি কি যাচ্ছে ওদেরই খোঁজে ?

এই রকম এক জোড়া মেয়েকে লেখক এক সময় চিনতেন। অনেক কাল আগের কথা। তখন তিনি উঠতি লেখক, এবং বেকার। সারা দিনে টিউশনি করতেন তিন জায়গায়। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এক বাড়িতে দুটি যমজ মেয়েকে পড়িয়ে ছিলেন মাস দুয়েক। বড়লোকের বাড়ি, কিন্তু সংসারে লোকজন খুব কম। বাবা-মা অনেক সময়ই থাকেন না। আজকের মেয়ে দুটির চেয়ে ওদের বয়েস ছিল কিছুটা কম, দুজনেই সবে মাত্র কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে।

ফুটফুটে দুটি মেয়ে, হুবহু একরকম মুখ। ওদের নাম ছিল সোনা আর মণি। কিন্তু কার নাম কোনটা তা বোঝা অসম্ভব। ওদের মাও চিনতে পারতেন কিনা কে জানে। আলাদা করার জন্য একজনের চুলে নীল রঙের, আর একজনের সোনালি ফিতে বাঁধা থাকত। তবু ভুল হত।

এই ভুল নিয়ে নানারকম মজা হত রোজই। শুধু একদিনই অন্যরকম। দুই বোনের মধ্যে একজন ছাড়া সেই দিনটির কথা অন্য কেউ জানে না। ওদের বাবা বোম্বাইতে বদলি হওয়ার জন্য ছমাস বাদে এই টিউশনিটা চলে যায় লেখকের।

সে আমলে গৃহশিক্ষক হিসাবে লেখকের বেশ সুনাম হয়েছিল। মন দিয়ে পড়াতেন তো বটেই, কখনও কামাই করতেন না। ঝড়-বাদল, স্ট্রাইক-হাঙ্গামা, তার মধ্যে দিয়েও হেঁটে আসতেন।

সে দিনটাও ছিল দুর্যোগের দিন। সারা দিন আকাশ কালো, বিকেল থেকে মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে। ঠিক সাড়ে ছটায় লেখক গিয়ে উপস্থিত হলেন সে বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটের দরজায়। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতন সেদিন আবার চলছে লোডশেডিং। কলিং বেল বাজছে না, উঠতি লেখক দরজায় টক টক শব্দ করলেন। অন্যদিন দরজা খুলে দেয় একজন বুড়ো কাজের লোক। সেদিন দরজা খুলল দু'জন ছাত্রীর মধ্যে একজন।

বসবার ঘরটা অন্ধকার। একটা মোমও জ্বালা হয়নি।

লেখকের পকেটে সিগারেট-দেশলাই। তিনি একটা কাঠি জ্বেলে বললেন, বাতি-টাতি কিছু নেই ?

মেয়েটি বললেন, আজ আর পড়া হবে না।

লেখক বললেন, অন্ধকারে আর কী করে পড়া হবে ? আমি মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে পারি, যদি তার মধ্যে আলো আসে !

মেয়েটি বলল, অন্ধকারে বসে থাকবেন ? রঘুটা বাজার করতে গেল, এখনও ফেরার নাম নেই। মোম-টোম কোথায় রাখে জানি না।

লেখক বললেন, তা হলে আমি চলে যাব ?

মেয়েটি বলল, একটু দাঁড়ান, আমি রান্নাঘরে একবার খুঁজে দেখি। আপনার দেশলাইটা দিন তো।

ঠিক তখনই বিরাট আওয়াজ করে একটা বাজ পড়ল। মেয়েটি ভয় পেয়ে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল লেখককে।

এরকম আওয়াজে অনেক পুরুষেরও বুক কেঁপে ওঠে, মেয়েরা তো ভয় পাবেই। লেখক বললেন, খুব কাছেই বোধহয় বাজ পড়েছে। যাক, ভয়ের কিছু নেই। দ্যাখো, যদি মোমবাতি --

মেয়েটি কিন্তু আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করল না। এবং লেখককে দারুণ চমকে দিয়ে বলল, আপনি আমাকে চুমু খাবেন না ?

লেখক বললেন, যাঃ, ও আবার কী কথা !

মেয়েটি বলল, কেন, সিনেমায় যে দেখায়, এই সময় চুমু খেতে হয়।

লেখক বললেন, সিনেমায় ... সে তো নায়ক-নায়িকারা ... আমি তো

মেয়েটি বলল, তাতে কী হয়েছে ? আমায় কেউ এখনও চুমু খায়নি। বাড়িতে এখন কেউ নেই।

লেখক জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বোন কোথায় ?

মেয়েটি বলল, সে বাথরুমে ঢুকেছে। সহজে বেরুবে না।

তারপর সে নিজেই লেখকের মুখের কাছে নিয়ে এল স্বর্গের পরীদের মতন নিজের নরম অধরোষ্ঠ।

লেখক শুকদেব নন। তিনি স্বাস্থ্যবান, সূক্ষ্ম অনুভূতিপরায়ন যুবক। ছাত্রীদের সঙ্গে তিনি কখনও প্রেম করার চেষ্টা করেননি। কিন্তু কোনও মেয়ে নিজে থেকে ঠোঁট বাড়িয়ে দিয়েছে, এ অভিজ্ঞতা তাঁর আগে হয়নি। তবু অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে তিনি বললেন, না, না, এটা ঠিক নয়। তুমি কোনজন ?

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলল, তা বলব কেন ?

ওই হাসিতেই সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। অপূর্ব মিষ্টি সেই হাসিটি যে ঠোঁটে লেগে আছে, সে ঠোঁট তো অমৃত।

চুম্বনটি বেশ দীর্ঘস্থায়ীই হল। মেয়েটি কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। হঠাৎ এক সময় আলো জ্বলে উঠল, তখনই মেয়েটি ছিটকে সরে গিয়ে দৌড়ে চলে গেল ভিতরে।

খানিক পরে তার দু'বোন ফিরে এল একসঙ্গে। কোনও একজনেরও চোখে সামান্য ইঙ্গিত নেই, ঠিক অন্যদিনের মতন। লেখকের তখনও বুক কাঁপছে।

তারপর আরও আড়াই মাস পড়িয়েছিলেন তিনি সে বাড়িতে। কোনওদিন এক মুহূর্তের জন্যও তিনি বুঝতে পারেননি, কোন মেয়েটির ঠোঁটের সঙ্গে মিলেছিল তাঁর ঠোঁট।

ওরা বোম্বাই চলে যাওয়ার পর আর জীবনে কখনও ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি। ব্যাপারটা মধুর স্মৃতি হয়ে ছিল অনেকদিন। তারপর আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে যাচ্ছিল। আজ আবার মনে পড়ল।

হাঁসগুলো আবার ডেকে উঠল একসঙ্গে। কোনও কারণ নেই, তবু কেন হঠাৎ হঠাৎ ডেকে ওঠে? সাপ-টাপ দেখেছে নাকি? বর্ষার সময় পুকুরে অনেক জলঢোঁড়া সাপ আসে। হাঁসরা সাপকে ভয় পায় না। সারা গায়ে পালক, সাপ ছোবল মারবে কোথায়? প্রকৃতিই ওদের এই আত্মরক্ষার উপায় দিয়েছে।

এক লাইনও গল্প লেখার নাম নেই, লেখক হাঁস-টাঁস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। সম্পাদক তাড়া দিচ্ছেন রোজ। সারা পৃথিবীতেই গল্প ছড়িয়ে আছে, চোখের সামনেও ঘুরে বেড়ায় অনেক গল্প। শুধু ঠিক জায়গায় ধরা দরকার। কিছুতেই যে তিনি আরম্ভ করতে পারছেন না।

লেখকের স্ত্রী নীচ থেকে ডাক দিলেন, অনেক বেলা হল, তুমি চান করতে যাবে না?

চড়াৎ করে বিদ্যুৎ চিরে গেল আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। হাওয়ার বেগ বেড়েছে, মনে হয় ঝড় আসন্ন। শিগগির বৃষ্টি আসবে।

লেখক ঠিক করলেন, যদি অনেকক্ষণ জোর বৃষ্টি হয়, তা হলে আজ আর স্নান করবেন না। আজ রেইনি ডে। খাওয়ার পর আর লিখতে বসতে ইচ্ছে করবে না।

গেটের বাইরে কলকণ্ঠ শোনা গেল।

সেই দুটি মেয়ে আর রূপবান যুবকটি এক সঙ্গে ফিরে যাচ্ছে। এ বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

একটি মেয়ে গলা তুলে বলল, আমরা একবার ভেতরে গিয়ে পুকুরটা দেখতে পারি?

দীনবন্ধুর বদলে এখন উৎপল একটা নিমগাছ থেকে পাতা পাড়ছে। সে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন না।

দোতলার ঘরে বসা লেখককে ওদের দেখতে পাওয়ার কথা নয়। ওরা লেখকের সঙ্গে দেখা করতেও আসেনি।

ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে অন্য মেয়েটি বলল, কী সুন্দর হাঁসগুলো দ্যাখ !

বিদ্যুৎ চমকের মতনই লেখকের মনে হল, এই মেয়ে দুটি কি সেই সোনা আর মণি ? এখন লেখক ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ওরা নিশ্চয়ই খুব চমকে উঠবে।

ওই সিনেমা স্টারের মতন ছেলেটি ওই দুজনের মধ্যে কার প্রেমিক ?

লেখক কোন মেয়েটিকে চুমু খেয়েছিলেন, তা আজও জানেন না। কিন্তু মেয়েটি তো জানে। এই ছেলেটি তার প্রেমিক হলে সে কি তাকে প্রথম চুম্বনের অভিজ্ঞতার কথা বলে দিয়েছে ?

তারপরই লেখক মনে মনে হাসলেন। যাঃ, এই মেয়ে দুটি সোনা আর মণি কী করে হবে ? সে তো বহু বছর আগেকার কথা। এতদিনে সোনা আর মণি গিন্নিবান্নি হয়ে গেছে, এমনকী ওদের নাতি-নাতনী হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য কিছু নয়।

এই মেয়ে দুটি খুব সম্ভবত যমজ বোনও নয়। চেহারায় খুবই মিল আছে। কিন্তু বোধহয় বয়েসের তফাৎও আছে দু'তিন বছর।

তবু লেখক এর মধ্যে একটা গল্পের গন্ধ পেয়ে গেলেন। যদি এতগুলি বছর সঙ্কুচিত করে চার-পাঁচ বছরে আনা যায় ?

একজন গৃহশিক্ষক এক ঝড়-বাদলের সন্ধ্যায় দুটি যমজ ছাত্রীর মধ্যে একজনকে একবার চুমু খেয়েছিল, এটা নিয়ে কোনও গল্প হয় না। কিন্তু চার-পাঁচ বছর পর যদি মেয়ে দুটির সঙ্গে আবার হঠাৎ লেখকের দেখা হয়ে যায় ? সঙ্গে যদি থাকে ওদের একজনের প্রেমিক ? তা হলে মনে মনে একটা খেলা চলতে পারে।

লেখক পেয়ে গেছেন গল্পের প্রথম লাইন।

তিনি লিখলেন, সেদিনও ছিল এক বজ্র-বিদ্যুতের সন্ধ্যা। সারা শহর অন্ধকার ...

....